‘জুমচাষ’ সম্পর্কিত ধারণা ও সংবাদপত্রের ভূমিকা

রাহমান নাসির উদ্দিন

সংবাদপত্রের একটি নিজস্ব এবং প্রতিষ্ঠিত ভাষা আছে। সেই ভাষার নিক্তিতে মাপলে এ লেখাটি ’প্রতিক্রিয়া’ নামক একটি শিরোনামের অমর্যাদা পায়। আসলে কোনটি ক্রিয়া (কুক্রিয়া!), কোনটি প্রতিক্রিয়া তা মাপ-ঝোঁক করার উপাত্ত কী হওয়া উচিত সেটা অমীমাংসিত। আমি এ লেখাটি লিখছি সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর একটি জাতীয় দৈনিকের একটি ছোট্ট মফস্বল সংবাদের বিশ্লেষণ করে। কিন্তু ঠিক যে অর্থে ‘প্রতিক্রিয়া’ বলা হয় সে অর্থে নয়। এর চেয়ে ঢের বেশি কিছু। সম্প্রতি বাংরাদেশের একটি জাতীয় দৈনিকে ‘আমার চট্টগ্রাম’ বিভাগীয় পাতায় ‘পার্বত্য চট্টগ্রামে আবার জুমচাষের প্রস্তুতি চলছে’ শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশি হয়। রিপোর্টার ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রতিনিধি’। বিধি জানে এ কোন প্রতিনিধি! এটি কেবল একটি সংবাদ নয়, এটি ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম’ এবং ‘জুমচাষ’ সম্পর্কিত আমাদের প্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলোকে বহি:প্রকাশ করে। তাই, এটিকে কেবল একটি সংবাদ হিসাবে নিলে চলবেনা, এর ভেতর দিয়ে আমাদের জাতিগত অজ্ঞতা, সংখ্যাগুর“ত্বের দেমাগ এবং প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস-ব্যবস্থার অসারতা প্রতীয়মান হয়। এ সংবাদটি আমি ’অন্জালে’ (ইন্টারনেটে) পড়েছি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসে কোন প্রতিনিধি সংবাদ লেখে আর আমি জাপানে বসে অন্জালে সেটা সংবাদ পাঠ করছি। ‘কীভাবে এ সংবাদ এতদুর এলো’-এর ভেতর দিয়ে আমাদের সমষ্টিগত দায়িত্ববোধকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়। কেননা, এ সংবাদ লেখা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে (অন্ত সংবাদপত্র তা’ই দাবি করে), ঢাকায় এসে মফস্বল সম্পাদকের দপ্তরে পাস হয়ে কম্পোজিটর, প্র“ফ রিডার, পেষ্টার, সম্পাদক হয়ে কাগজ এবং নেট-ভার্সন। এরকম একটি সংবাদ(!) কীভাবে এতগুলো মানুষের হাত ফসকে বেরিয়ে যায় তাও ভাবনার বিষয় বটে। আমি সংবাদটি অনুপুংখ বিশ্লেষণ করছি।

সংবাদটি প্রথম বাক্যটি হ“ছে ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের অজ্ঞ-মুর্খ উপজাতিরা এ বছর আবার সর্বনাশী পরিবেশ বিধ্বংসী জুমচাষের প্রস্তুতি নি“ছে’। এখানে তিনটি কনসেপ্ট ’অজ্ঞ-মুর্খ’ ‘উপজাতি’ এবং ‘সর্বনাশা পরিবেশ বিধ্বংসী জুমচাষ’ বিশ্লেষণের দাবী রাখে। ‘অজ্ঞ-মুর্খ’ কারা, কেন এবং কোন তত্ত্বের বাটখারায় মেপে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের এথনিক জনগোষ্ঠীকে ‘অজ্ঞ-মুর্খ’ বলতে পারি? যদি কেউ পাঠ্যপুস্ক, স্কুল, কলেজ, সার্টিফিকেট, পাস/ফেল কনসেপ্টের সাথে ‘অজ্ঞতা-মুর্খতা’র সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করেন তবে তার ’জ্ঞানতা-অমুর্খতা’ নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়। কেননা, আজকের বিশ্বে ‘অজ্ঞতা-মুর্খতা’র সাথে ‘অক্ষর-জ্ঞানতা’র কোন সম্পর্ক নাই। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বো“চ ডিগ্রীধারি শিক্ষিত লোকও জ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রে মুর্খ (!) এবং অজ্ঞ হতে পারে। উদাহারণ স্বরূপ, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও নৌকা চালানোর ক্ষেত্রে একজন মাঝির তুলনায় অজ্ঞ হতে পারে। একজন ইঞ্জিনিয়ারও একজন জেলের মাছ ধরার জ্ঞান-পদ্ধতির তুলনায় অজ্ঞ হতে পারে। সুতরাং ’অজ্ঞতা-মুর্খতা’ বিষয়টি আপেক্ষিক। জ্ঞানকান্ডের সনাতন চিন্তার বিপরীতে সাধারণ মানুষের এ ‘অসাধারণ’ জ্ঞান নিয়ে বিশ্বব্যাপি বিস্তর গবেষণা হয়েছে এবং হ“ছে। ‘জ্ঞান’ কী? কাকে আমরা ‘জ্ঞান’ বলবো?-এ প্রশ্নকে কেন্দ্রীয় বিষয় করে বিদ্যাপাড়ায়-জ্ঞান মহল্লায় ঝড় বয়ে গেছে। অবশেষে, এ ‘অজ্ঞ-মুর্খ’দের জ্ঞানকেই স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। কেননা, গত শতাব্দীর সত্তর/আশির দশকেই ‘জ্ঞান’-এর সংজ্ঞা পাল্টে গেছে। জ্ঞান এখন আর কেবল সনাতন বিদ্যালয়-শিল্পে পয়দা হয়না। সাধারণ মানুষেরও রয়েছে ‘স্বজাত জ্ঞান’। সে জ্ঞানে তারা এতোটাই সমৃদ্ধ যে, ‘স্বজাত জ্ঞান’কে পাশ্চাত্য তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে তুলনা করা হয়। এবং ক্ষেত্র বিশেষে এ ‘স্বজাত জ্ঞান’ কে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয় এর সহজসভ্যতা, প্রায়োগিত দ্র“ততা এবং পাশ্বপ্রতিক্রিয়াহীন শতাব্দী অবধি উপযোগিতার কারণে। সে স্বীকৃতির আলোকে, পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস রত এথনিক জনগোষ্ঠীকে কোন অর্থেই ‘অজ্ঞ-মুর্খ’ বলার কোন অধিকার আমাদের নেই। অধিকন্তু, ‘জুমচাষ’ পদ্ধতিকে যদি একটি প্রতিষ্ঠিত ‘জ্ঞান’ ধরি, সেখানে আমরা কে কতোটা ‘অজ্ঞ-মুর্খ’ তার মাপ-ঝোক করা যেতে পারে। তাতে, নিজের চেহারা-সুরতটাও একবার পরখ করা যাবে।

আর ‘উপজাতি’ শব্দটি একটি মেজরিটি বাঙ্গালী দেমাগ-প্রসুত প্রত্যয়। পৃথিবীর কোন প্রান্তে কোন জনগোষ্ঠীকে ‘উপজাতি’ ঝঁংন-হধঃরড়হ্ হিসাবে ডাকা হয়না। সত্যিকার অর্থেঁংন-হধঃরড়হ্ কোন ধারণাকেই সুশীল জ্ঞানকান্ড সমর্থন করেনা। অতএব, এসব ‘শব্দ’, শব্দের অন্র্গত অর্থ এবং এর জন্মগত-ইতিহাস খুবই দু:খ জনক এবং লজ্জাজনক। আমি আলোচনাকে সেদিকে নিয়ে কেঁচু খুড়তে সাপ বের করতে চাই না! পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত এথনিক জনগোষ্ঠীকে ‘উপজাতি’, ‘আদিবাসি’, ‘ট্রাইবাল’, ‘পাহাড়ী’ প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহার করে ‘সনাক্ত’ করা হয়। এসব শব্দপুঞ্জের অন্র্নিহিত অর্থ আমরা কখনো ঘাটার চেষ্টা করিনা। আমরা কেবল উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক এসব ‘প্রত্যয়’ ব্যবহার করি। যার মধ্য দিয়ে পাব্যর্ত চট্টগ্রামের ওপর বাঙ্গালী ঔপনিবেশিক মানসিকতারও বহি:প্রকাশ ঘটে। এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনার প্রয়োজন আছে, যার জায়গা এটা নয়। তবে, সংবাদপত্রের যে প্রতিষ্ঠিত ‘ভাষা’ ও ‘ডিসকোর্স’, সেখানে এ আপত্তি ও বিতর্কাদিকে বিবেচনায়

নিলে 'অজ্ঞতা-মুর্খতা'র কিছুটা অবসান হয়। 'সর্বনাশা পরিবেশ বিধ্বংসী জুমচাষ'-এটি আরেকটি বড় মারাত্মক ভুল ধারণা এবং বিশ্বাস। এই যে একটি ভুল ধারণা ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে একটি 'জ্ঞানকান্ড' তৈরী হ"ছে বা হয়েছে, এর পেছনে সংবাদপত্রের দায় ও দায়িত্ব কতটুকু তা বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

'জুমচাষ' নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা ও বদ্ধমুল বিশ্বাস (সর্বার্থে নেতিবাচক) বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ঘাড় সোজা করে দাঁড়িয়ে গেছে। এর পেছনে, মুল প্রণোদনা জুগিয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর ক্ষমতাধীন বিভিন্ন সরকার এবং সরকারী প্রচার-মাধ্যম। তার সাথে ইন্দন দিয়েছে ভাড়াটে পরিবেশ-পন্ডিত এবং ক্ষমতা-উ"ছিষ্ট ভোগী দলীয় বুদ্ধিজীবী। উপরি পাওনা হিসাবে ছিলো, মগজবিহীন সাংবাদিক (পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশিরভাগ সাংবাদিক নিয়োগ দেয়া হয় বাঙ্গালী সেটেলারদের মধ্য থেকে)। ফলে, জুমচাষের যে আদি পদ্ধতি তাকে একটি 'মারাত্মক পরিবেশ বিধ্বংসী (!)' রঙ দেয়া হয়েছে। কিন্তু জুমচাষ কেবল বাংলাদেশের পাবর্ত্য চট্টগ্রামেই হয় না, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ ধরণের চাষ পদ্ধতির প্রচলন আছে। তবে ভিন্ন নামে, ভিন্ন পরিচয়ে। যেমন, থাইলেন্ডের 'কারেন' জনগোষ্ঠী, ইন্দোনেশিয়ার সাউথ কালিমান্টান পার্বত্য এলাকার 'দায়াক' জনগোষ্ঠী, মালয়েশিয়া বর্ডারের 'সারাওয়াক' ও 'কেনিয়া' জনগোষ্ঠী, মালয়েশিয়ার 'মালায়া' জনগোষ্ঠী, মিয়ানমারের 'কাচিন' জনগোষ্ঠী, লাউসের 'বানসোত' জনগোষ্ঠী, এমন কি ভারতের আসামে বসবাসরত 'আদি'(!) জনগোষ্ঠী প্রভৃতি পুরোপুরি ভাবেই 'জুমচাষের' ওপর নির্ভরশীল। শত শত বছর ধরে বংশ পরম্পরায় এসব জনগোষ্ঠী জুমচাষ করেই জীবন-জীবিকার প্রয়োজন মিটিয়ে আসছে। এবং নিজেদের জীবন ও জীবিকা নিয়ে সুখে-শান্তিতে দিনতিপাত করেছে। যদি এ জুমচাষ সত্যিই 'সর্বনাশা মারাত্মক পরিবেশ বিধ্বংসী' হতো, তবে তো এতোদিনে তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা। সমস্যা যদি কিছু সৃষ্টি হয়েই থাকে, তবে তা হয়েছে আলগা লোকের বেহুদা নাগ গলানোর কারণে। রাষ্ট্রের অহেতুক কতৃত্ববাদিতার জন্য। সত্যিকার অর্থে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 'এথনিক' জনগোষ্ঠী ইস্যুতে বিদ্যমান সরকারের আধিপত্যবাদি চরিত্র প্রায়ই একই থাকলেও, বাংলাদেশের মতো বির"দ্ধ-মানসিকতা প্রসুত 'সর্বনাশা' চরিত্র নেই। মুলত: জুমচাষ হ"ছে সর্বার্থেই প্রায়োগিক বিবেচনায় একধরণের 'পরিবেশ বান্ধব' চাষ পদ্ধতি। যে পদ্ধতিতে জুমচাষ করা হয়, তাতে পরিবেশের ভারসাম্যহানির কোন ধরণেরই সম্ভাবনা নেই। কেননা, একবছর যে জায়গা জুড়ে জুমচাষ করা, তা পরের ১০/১৫ বছর অনাবাদি রাখা হয়, যাতে সে জায়গা পুনরায় পুর্বরূপে তৈরী হয়। এবং এ প্রক্রিয়ায় জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস-বৃদ্ধির প্রশ্ন অবান্র। বিতর্কের খাতিরে যদি ধরেই নিই, একই জায়গায় বারবার চাষ করার ফলে জমির উর্বতা শক্তি কমে যা"ছে, তাহলে প্রশ্ন আসবে এর জন্য প্রকৃতার্থে দায়ী কে? জোর করে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর ই"ছার বির"দ্ধে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ (১৯৫৯-৬৩ সালে এ বাঁধ তৈরী হয়ে যা ৪০% চাষ-যোগ্য জমিকে পানির নিচে তলিয়ে দেয়) এবং আশির দশকে চার লক্ষাধিক লোককে পার্বত্য এলাকায় মাইগ্রেন্ট করানোর মধ্যদিয়ে জুমচাষের জমিতে জনবসতি তৈরী করা হয়েছে। জুমচাষের জমি সংকোচিত হয়েছে। ফলে, একবার চাষ করার পর জায়গাটিকে ১০/১৫ বছর আর ফেলে রাখা সম্ভব হয়না। ৭/৮ বছরের মধ্যেই পুনরায় জুমচাষের জন্য এ জায়গা নির্ধারণ করতে হয়। এর মধ্যদিয়ে ফলনও হ্রাস পা"ছে এবং জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা নিশ্চয়তা ব্যহত হ"ছে। এর দায়-দায়িত্ব কে নেবে? পার্বত্য অঞ্চলের পরিবেশ যদি সত্যিই সামান্যতমও ধ্বংস হয়, এর জন্য দায়ী বিভিন্ন সরকারের ঔপনিবেশিক মানসিকতা, সরকারের অমানবিক পলিসি, আধিপত্যবাদি নীতিনির্ধারণী প্রভৃতি। এসব বিষয়াদিকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। ঢালাওভাবে 'মারাত্মক পরিবেশ বিধ্বংসী' বলে পার্বত্য অঞ্চলের এথনিক জনগোষ্ঠীকে দায়ী করার এ মানসিকতা একান্ই অনভিপ্রেত।

সংবাদে দু:খ প্রকাশ করা হয়েছে, কেন সরকারীভাবে জুমচাষ বন্ধের কোন ব্যবস্থা নেয় হ"ছে না। পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'ট্রাইবাল পপুলেটেড এরিয়া' হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্র আইনগত ভাবে এ স্বীকৃতি দিয়েছে। সেখানে, তাদের জীবন, অস্তিত্ব ও জীবিকার প্রধান মাধ্যম জুমচাষকে কীভাবে সরকারী পদক্ষেপে বন্ধ করে দেয়ার চিন্া করা হয়, তা সত্যিই বিস্ময়কর। সংবাদে মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ও পরিবেশ বিজ্ঞানীর কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সুনির্দিষ্ট কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, এটা কেবল সংবাদপত্রের ভাষা। (যেমন, বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, সাধারণ মানুষের দাবি প্রভৃতি যার অস্তিত্ব প্রশ্নাধীন)। এ ভাষায় সত্যিকার অর্থেই কোন মৃত্তিকা বিজ্ঞানী বা পরিবেশ বিজ্ঞানী অস্তিত্ব নেই। এখানেই সংবাদপত্রের দায়-দায়িত্বের প্রশ্ন আসে। বাংলাদেশের মফস্বল সাংবাদিক ও সংবাদের যে দশা, তাতে কেন্দ্রের সজাগ দৃষ্টি একান্ই প্রত্যাশিত। সংবাদ যখন কেন্দ্রে পৌঁছায়, তখন তার যথার্থতা নিরীক্ষণ করার প্রয়োজন আছে, যাতে মিসলিডিং কোন বিষয় ফাঁক গলে বেরিয়ে না যায়। আর আজকের আধুনিক প্রযুক্তির কালে সেটা আর রাষ্ট্রীয় সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকেনা। পৃথিবীর যে কোন প্রান্ে বসে, সেটা অবগত হওয়া সম্ভব। 'জুমচাষ' কিংবা 'উপজাতি (!)' প্রভৃতি স্পর্শকাতর বিষয়ে সংবাদপত্রের আরো মনোযোগ কাঙ্ক্ষিত। কেননা, কোন বিষয়ে একটি 'ডিসকোর্স' তৈরীতে সংবাদপত্রের ভুমিকা ইতিবাচক-নেতিবাচক উভয়ই হতে পারে। আমাদের যখন রাষ্ট্র-রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আইন-শৃংখলা, নীতি-মুল্যবোধ সর্বক্ষেত্রে নেতিবাচকতা, সেখানে সংবাদপত্রের কাছে কি আমরা সক্রিয় ইতিবাচকতার দোহাই তুলতে পারিনা?

রাহমান নাসির উদ্দিন: পি.এইচ.ডি. গবেষক, কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান ও সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল:rahmannasircu@yahoo.com